## ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি

# চোর পালালে বুদ্ধি বেড়ে লাভ কী

**আরিফ খান মিরণ**

একজন মানুষ ঠিকমতো দাঁড়াতে চাইলে দুটি পায়ের দরকার হয়। একটি দেশ ঠিকমতো দাঁড়াতে চাইলে কয়টি পায়ের দরকার হয়? ধরে নিলাম এক হালি। এর মধ্যে কোন পাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী? নিঃসন্দেহে সেই পায়ের নাম অর্থনীতি। অর্থনীতি হলো একটি দেশের সম্পদ বাটোয়ারের নীতি। তার মানে, দেশের সম্পদ এবং সেই সম্পদের ভাগ বন্টনের নীতিকেই বলা হয় ঐ দেশের অর্থনীতি। একটি দেশ তার নিজের পায়ে দাঁড়াবে কি না তা নির্ভর করে ঐ দেশের সম্পদের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ও বন্টন ব্যবস্থা কতোটুকু দক্ষ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ। সম্পদ অনেক ধরনের হতে পারে। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো শক্তিসম্পদ (Energy Resources)। এই শক্তিসম্পদের মাঝে তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, সৌর, পানিবিদ্যুৎ, কয়লা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর সুষ্ঠু, সুন্দর ও সার্বিক শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবহারের ওপর দেশের অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার সিংহভাগই নির্ভর করে। এ সম্পদসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ১৯৯৫ সালে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এর নাম National Energy Policy. নিদারুণ হতাশার বিষয়, সেই 'পলিসি' এখন 'পলিটিক্স'-এর গ্যাঁড়াকলে পড়ে খাবি খাচ্ছে। ১১ বছর আগে প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী যদি আমাদের সম্পদ ব্যবস্থাপনা করা হতো তাহলে এখনও কয়লা, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে যে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে তা দেখা দিতো না। নীতিমালা করা হয়েছে ঠিকই। সুন্দর নীতিমালা। কিন্তু সেই নীতিমালা মানার নীতি কই?

### কী আছে নীতিমালায়

নীতিমালা হিসেবে এটি সত্যিই একটি সুন্দর নীতিমালা। এর প্রণয়নের পেছনে আমাদের প্রণেতাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে তা তাদের ভাষায়, 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনার্জির প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এনার্জি সেক্টরের সার্বিক উন্নতির জন্য নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ দিয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের জরিপ, উত্তোলন ও অনুসন্ধান। জলশক্তির জরিপ ও অনুসন্ধান, কয়লা এবং পিট অনুসন্ধান, পেট্রোলিয়াম পরিশোধন সুবিধা ও বন্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ, পাওয়ার জেনারেশন প্লান্ট এবং বিদ্যুৎ প্রেরণ ও বন্টনের নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠাকরণ।' এই হলো ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি প্রণয়নের পেছনের মোদ্দা কথা। এই পলিসি প্রণয়নের আগে এনার্জি প্রকল্পের কী কী সীমাবদ্ধতা ছিল তাও এখানে বলা হয়েছে। যেমন :

ক. পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে দেশজুড়ে পদ্ধতিগতভাবে শক্তিসম্পদের জরিপ, উত্তোলন ও অনুসন্ধান সম্ভব হয়নি। ফলে দেশের বিভিন্ন অংশে শক্তিসম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

খ. এনার্জি সেক্টরে ব্যক্তিমালিকানা উদ্যোগের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য পর্যাপ্ত মনোযোগ দেয়া হয়নি। এতে করে মূলধনের ঘাটতি কাটিয়ে ওঠা যেতো।

গ. কমার্শিয়াল এনার্জির স্বল্পতা ও অনির্ভরযোগ্য যোগাযোগের কারণে বেশি এনার্জি প্রয়োজন হয় এমন খাতের (যেমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর) উন্নয়ন সাধন সম্ভব হয়নি।

ঘ. এনার্জি এজেন্সিগুলো দক্ষতার সঙ্গে চালিত ও ব্যবস্থিত হয়নি।

ঙ. এর দাম নির্ণয় পদ্ধতিরও কোনো যৌক্তিক ভিত্তি ছিল না।

চ. এনার্জির যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর মানদন্ড নিশ্চিত করা যায়নি।

ছ. বায়োগ্যাস ফুয়েলের অপরিকল্পিত ব্যবহার প্রাকৃতিক ক্ষতিসাধন করছে।

জ. গ্রামীণ এলাকার পূর্ণ এনার্জি প্রয়োজনীয়তার দিকে মনোযোগ দেয়া হয়নি।

ঝ. দেশীয় প্রযুক্তিগত সামর্থ্যের উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত মনোযোগ ও পদ্ধতিগত গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়নি।

ঞ. এনার্জি সেক্টরের দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ উন্নয়নের দিকেও নজর দেয়া হয়নি।

এরই প্রেক্ষিতে সরকার এনার্জি চাহিদার প্রয়োজন পূরণার্থে ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি প্রণয়ন করে। একটি সুসংহত ও সংবদ্ধ এনার্জি সেক্টর গড়ে না ওঠার পেছনে যে কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো নিঃসন্দেহে সত্য এবং সুনির্দিষ্ট। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, পলিসি প্রণয়নের এই ১১ বছর পরও পিছিয়ে পড়ার যে কারণ চিহ্নিত হয়েছে, আমরা সেই পিছিয়ে পড়া স্তরেই আছি। এ তো গেল পলিসি প্রণয়নের পরিপ্রেক্ষিত, এবার দেখা যাক পলিসি প্রণয়নের উদ্দেশ্য?

### ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির উদ্দেশ্য

ক. টেকসই উন্নয়নের জন্য এনার্জি সরবরাহকরণ, যাতে করে এনার্জি স্বল্পতার জন্য বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়ন কর্মকান্ড থেমে না যায়।

খ. দেশের বিভিন্ন অংশের এবং আর্থ-সামাজিক দলের এনার্জির প্রয়োজনীয়তার মীমাংসা করা।

গ. সবগুলো দেশীয় এনার্জি উৎসের সর্বোচ্চ উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ঘ. এনার্জি ব্যবহারের টেকসই উত্তোলন

**সেই 'পলিসি' এখন 'পলিটিক্স'-এর গ্যাঁড়াকলে পড়ে খাবি খাচ্ছে। ১১ বছর আগে প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী যদি আমাদের সম্পদ ব্যবস্থাপনা করা হতো তাহলে এখনও কয়লা, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে যে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে তা দেখা দিতো না। নীতিমালা করা হয়েছে ঠিকই। সুন্দর নীতিমালা। কিন্তু সেই নীতিমালা মানার নীতি কই**

ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঙ. সবগুলো এনার্জি উৎসের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

চ. পরিবেশবান্ধব টেকসই এনার্জি উন্নয়ন প্রকল্পের নিশ্চয়তা বিধান করা যা পরিবেশের ন্যূনতম ক্ষতি করবে।

ছ. এনার্জি সেক্টরের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরকে উৎসাহ দেয়া।

এবার আমরা আমাদের আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটাতে এসে হাজির হয়েছি। ওপরে দেখলাম কী কী উদ্দেশ্য নিয়ে ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি প্রণয়ন করা হয়েছিল। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, প্রণীত পলিসি অনুসারে আমাদের অর্জন কতোটুকু? কোনো গভীর তাত্ত্বিক ও পরিসংখ্যানিক হিসাব ছাড়াই শুধু চারপাশের বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেই বলে দেয়া যায়, লিখিত ও সুনির্দিষ্ট পলিসি থাকা সত্ত্বেও আমাদের অর্জন শূন্য।

**১১ বছরে নীতিমালার অর্জন**

সব উদাহরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না। আমি শুধু হালের বিদ্যুৎ সমস্যা, কয়লাখনি প্রকল্প ও গ্যাস দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ থেকেই প্রমাণ করতে সক্ষম হবো যে, হয়তো আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকরা নীতিমালা অনুসরণের পদ্ধতিটাতেই অভ্যস্ত নয়। যেমন-

**বিদ্যুৎ বিভীষণ**

ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির 'পাওয়ার' অনুচ্ছেদে গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের পরিসংখ্যান টেনে শেষে মন্তব্য করা হয় In order to increase the contribution of elctricity in economic growth it is necessary to increase the productive use of electricity. অর্থাৎ অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিদ্যুতের অবদান বাড়ানোর জন্য বিদ্যুতের প্রডাকটিভ ব্যবহার বাড়ানো দরকার। অর্থাৎ এই মন্তব্য করার আগে বিশেষজ্ঞরা বিগত ১০-২০ বছরের পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখেছেন যে, দেশের টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য বিদ্যুতের প্রডাকটিভ্ ব্যবহার বাড়ানো জরুরি। এর বিন্দুমাত্রও এই ১১ বছরে করা হয়নি। চলতি সময়ে সারা দেশে লোডশেডিংয়ের সর্বগ্রাসী ছোবল দেখলেই টের পাওয়া যায় সরকারের নীতিনির্ধারকরা 'টেকসই উন্নয়ন'-এর বুলিটাকে কতো হালকাভাবে গ্রহণ করেছেন।

দীর্ঘদিন ধরে দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি চলছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে চাহিদা। ফলে বিদ্যুৎ ঘাটতি দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। ঘাটতি পূরণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে সরকারগুলোর অব্যাহত ব্যর্থতা আজ এ পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। দেশে বর্তমানে বিদ্যুতের প্রকৃত চাহিদার পরিমাণ সাড়ে ৪ হাজার মেগাওয়াট। চাহিদার বিপরীতে দেশের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ৩ হাজার ৭০০ মেগাওয়াট। কিন্তু নানা কারণে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৯/১০টি ইউনিট বন্ধ থাকায় এখন উৎপাদন হচ্ছে ৩ হাজার ৪০০ মেগাওয়াটের মতো। গত চার বছরে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে মাত্র ১০৫ মেগাওয়াট, আগামী দু-তিন বছরের মধ্যে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ার কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

তাহলে কী লাভ হলো এতো সুন্দর ঝকঝকে নীতিমালা অনুসরণ করে, যদি নীতিমালা অনুসরণ করে কাজই না করা হবে। আমরা হাস্যকরভাবে 'নীতিমালাসর্বস্ব'। আমাদের নীতিমালা থাকলেই হয়, অনুসরণের দরকার নেই। যেমন আমাদের সংবিধান আছে ঠিকই, কিন্তু যে দলই ক্ষমতায় যায় তখন আর সংবিধান মানার তোয়াক্কা করে না।

চাহিদার বিপরীতে দেশের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ৩ হাজার ৭০০ মেগাওয়াট। কিন্তু নানা কারণে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৯/১০টি ইউনিট বন্ধ থাকায় এখন উৎপাদন হচ্ছে ৩ হাজার ৪০০ মেগাওয়াটের মতো। গত চার বছরে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে মাত্র ১০৫ মেগাওয়াট, আগামী দু-তিন বছরের মধ্যে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ার কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না

**চোর পালিয়েছে ঠিকই কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি**

দেশের এনার্জি সেক্টরকে একটি সার্বিক ও সুসংবদ্ধ নীতিমালার অধীনে বিবেচনায় না এনে কাজ করলে যে কী ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তা আমরা ইতিমধ্যে দিয়েছি এবং যে ধারা অব্যাহত আছে তা দেখলে মনে হয়, এ ক্ষতি ভবিষ্যতেও চলবে।

মাগুরছড়া ১৪ নং গ্যাস ব্লকের অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধ গ্যাসক্ষেত্র। বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানির বিনিয়োগের জন্য আগত বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী ও অংশীদাররা ১৯৯৭ সালের ১৪ জুন রাতে মাগুরছড়া ১ নং অনুসন্ধান কূপে খনন চলাকালে বিস্ফোরণ ঘটায়। মাগুরছড়া গ্যাসকূপ বিস্ফোরণের পরপরই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহফুজুল ইসলামকে প্রধান করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি এক মাসের মধ্যে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে ১৯৯৭ সালের ৩০ জুলাই মন্ত্রণালয়ের সে সময়ের সচিব ড. তৌফিক-ই-এলাহি চৌধুরীর কাছে দুটি ভলিউমে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়। পরবর্তীতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এ বিস্ফোরণের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, ক্ষতিপূরণ পাওয়া ও বিতরণের বিষয়ে তদন্ত কমিটির সদস্য ক্যাপ্টেন (অবঃ) এ বি তাজুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে ৩ সদস্যের একটি সাব-কমিটি গঠন করে। কমিটির অন্য দু'জন সদস্য ছিলেন আওয়ামী লীগের এমপি ইমরান আহমেদ ও জাতীয় পার্টির এমপি মুকিত খান। তদন্ত কমিটির একজন সদস্য সাব-কমিটিকে জানান, পরিকল্পনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে অক্সিডেন্টালের ব্যর্থতার জন্যই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। কমিটির তদন্তে অক্সিডেন্টালের কাজে ১৫-১৬টি ত্রুটি ধরা পড়ে। অক্সিডেন্টালের কর্মকর্তা ২-৩টি ত্রুটির ব্যাপারে আপত্তি জানালেও বাকিগুলো স্বীকার করে নিয়ে তদন্ত রিপোর্টে স্বাক্ষর করে। তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, মার্কিন কোম্পানি অক্সিডেন্টালের খামখেয়ালিপনার কারণেই ঘটে যাওয়া এ বিস্ফোরণে চা বাগান, বনাঞ্চল, বিদ্যুৎ লাইন, রেলপথ, গ্যাস পাইপলাইন, গ্যাসকূপ, মৌলভীবাজার স্ট্রাক্চার, গ্যাস রিজার্ভ, পরিবেশ, প্রতিবেশ ভূমিস্থ পানিসম্পদ, রাস্তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ছোট বড় ২৯টি চা বাগানের ক্ষতির পরিমাণ ৪৬ কোটি ৬ লাখ ৮৪ হাজার ৮৩০ টাকা। বনাঞ্চলের ৬৯.৫ হেক্টর এলাকার ২৫ হাজার ৬৫০টি পূর্ণবয়স্ক গাছ আগুনে পুড়ে গেছে বলে হিসাব করা হয়, যার ক্ষয়ক্ষতি ধরা হয় প্রায় ৩৩.৬১ কোটি টাকা। একটি বনের স্বাভাবিক উচ্চতার গাছ বাড়তে প্রয়োজন হয় ৫০ থেকে ৬০ বছর। এ বনের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে কমপক্ষে ১১০ বছর সময় লাগবে। প্রতি বছর ৮০.৩০ কোটি টাকা হিসাবে ১১০ বছরে বনাঞ্চলের পরিবেশগত ক্ষতির পরিমাণ দেখানো হয় ৮ হাজার ৮৩৯ কোটি টাকা। বনাঞ্চলের আংশিক ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে ৮ হাজার ১০০ গাছ এবং ২২.৫০ হেক্টর ভূমি। উক্ত ক্ষতি থেকে উদ্ধার পেতে সময় লাগবে ২০ বছর; ঐ ক্ষতি বাবদ ধরা হয়েছে ৫০৭.১২ কোটি টাকা। এছাড়া বনাঞ্চলের সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ধরা হয়েছে ৪০

হেক্টর ভূমি এবং ১৫ হাজার ৪৫০টি গাছ। উক্ত ক্ষতি থেকে পুনরুদ্ধার পেতে সময় লাগবে ১০ বছর এবং ক্ষতি বাবদ ধরা হয়েছে ৪৮৪.৫৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ বনাঞ্চলের মোট ক্ষতি ধরা হয়েছে ৯ হাজার ৮৫৮ কোটি ৩১ লাখ টাকা। বিস্ফোরণের ফলে ২ হাজার ফিট রেলওয়ে ট্র্যাক ধ্বংস হয়েছে, এতে ক্ষতি দেখানো হয়েছে ৮১ লাখ ৫ হাজার ৩৯৫ টাকা (রাজস্ব ব্যতীত)। সড়কপথ (রাজস্ব ব্যতীত) বাবদ ক্ষতি ২১ কোটি টাকা। গ্যাস পাইপলাইন (রাজস্ব ব্যতীত) বাবদ ক্ষতি ১৩ লাখ টাকা। বিদ্যুৎ লাইন (রাজস্ব ব্যতীত) বাবদ ক্ষতি ১ কোটি ৩৫ লাখ ৯ হাজার ১৮৬ টাকা। খাসিয়া পানপুঞ্জির অধিবাসীদের পানের বরজসমূহ (রাজস্ব ব্যতীত) বাবদ ক্ষতি ধরা হয়েছে ১৮ লাখ টাকা। বাস মালিকদের রাজস্ব ক্ষতি ধরা হয়েছে প্রতিদিন ৪৭ হাজার ৭৫০ টাকা হারে মোট ১২ লাখ টাকা। (তথ্যসূত্র : তদন্ত রিপোর্ট, ৩০ জুলাই, ১৯৯৭ ইং) তদন্ত রিপোর্টে মাগুরছড়া বিস্ফোরণে পুড়ে যাওয়া ভূ-গর্ভস্থ উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ২৪৫.৮৬ বিসিএফ উল্লেখ করা হলেও আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে প্রতি ১ হাজার সিএফ গ্যাস ২.৬ মার্কিন ডলার হিসাবে বাংলাদেশী টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। তদন্ত রিপোর্টের ৮.৪.৬ ও ৮.৬ অনুচ্ছেদ যথাক্রমে ভূগর্ভস্থ পানিসম্পদ ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দেয়া হয়েছে, কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হয়নি। ভূগর্ভস্থ পানিসম্পদ ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নিরূপণের সুপারিশ করা হয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী মাগুরছড়ার মোট ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা।

আর টেংরাটিলার কথা নাইবা বললাম। নাইকো কোম্পানি ও বাপেক্স যৌথভাবে ছাতক গ্যাসক্ষেত্রের মজুদ নতুনভাবে নির্ধারণ করে। মোট মজুদ প্রায় ৪০০ বিলিয়ন ঘনফুট। এ পরিমাণ গ্যাসের বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৫ হাজার ৫৬৫.২১ কোটি টাকা। এমন বিশাল সম্ভাবনাময় একটি গ্যাসক্ষেত্র পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। দায়ী কোম্পানির কিছুই করা গেল না। এছাড়াও ঐ দুর্ঘটনা কবলিত এলাকার পরিবেশ প্রতিবেশ, প্রাণী, জনস্বাস্থ্য, ভৌতকাঠামো, জনস্বাস্থ্য ও জনসম্পদের যে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার কোনো গবেষণালব্ধ হিসাব নেই। আমাদের সম্পদ ও গরিবের সম্পদ, তা পুড়লেই কী আর পুড়ে ছাই হলেই বা কী!

**কয়লা যখন সম্পদ**

কয়লাকে সম্পদ হিসেবে বাঙালি বোধ হয় বেশি দিন আগে থেকে ভাবেনি। খুব বেশি বিরক্ত হলে লোকে বলে অমুক জিনিসটা আমার জীবনকে কয়লা করে ছেড়েছে, অর্থাৎ

**বিশেষজ্ঞদের মতে, উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লাখনি খনন করলে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হবে। পুরো এলাকার পানি শুকিয়ে মরুভূমি হতে পারে। আর এজন্য বাংলাদেশের ক্ষতি হবে জীবন ও পরিবেশ বাদে ৯ হাজার কোটি টাকা। একই সঙ্গে এই খনি উন্নয়নে নিয়োজিত কোম্পানি এশিয়া এনার্জির লাভ হবে কমপক্ষে ১ লাখ কোটি টাকা**

বরবাদ করেছে। কিন্তু এখন আমরা জানি কয়লাও সম্পদ। যেনতেন সম্পদ না, বিশাল সম্পদ। এবং সৌভাগ্যক্রমে আমরা এই বিপুল সম্পদের মালিক। কয়লা ধুলে ময়লা না গেলেও এটা ধুয়ে যে আমাদের গরিবিয়ানা কাঠানো সম্ভব তা বলা বাহুল্য। কয়লা সম্পর্কে আমাদের ন্যাশনাল এনার্জি পলিসিতে বলা হয়েছে, 'দেশের ভবিষ্যৎ এনার্জি ঘাটতি পূরণে কয়লা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বড়পুকুরিয়া খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য একটি কোল মাইনিং প্রজেক্ট প্রকল্পাধীন আছে। দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির জন্য একটি কোল মাইনিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। তা ভবিষ্যতে যখন খালাসপির থেকে কয়লা উত্তোলনের বিবেচনা করা হবে তখন সেজন্য আলাদা একটা কোম্পানি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হবে।'

সেই বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে এখন কয়লা উত্তোলন শুরুর পর্যায়ে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে সেখান থেকে কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে একে বলে উন্মুক্ত খনন পদ্ধতি। বিশেষজ্ঞদের মতে, উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লাখনি খনন করলে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হবে। পুরো এলাকার পানি শুকিয়ে মরুভূমি হতে পারে। আর এজন্য বাংলাদেশের ক্ষতি হবে জীবন ও পরিবেশ বাদে ৯ হাজার কোটি টাকা। একই সঙ্গে এই খনি উন্নয়নে নিয়োজিত কোম্পানি এশিয়া এনার্জির লাভ হবে কমপক্ষে ১ লাখ কোটি টাকা।

তাই এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে কয়লাখনি উৎপাদন ও সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য দক্ষ জনশক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দাঁড় করানোর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। সেই সঙ্গে কয়লার রয়ালটি নির্ণয়ের বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হবে। তেল-গ্যাস উত্তোলন আর কয়লা উত্তোলন এক কথা নয়। তাই তেল-গ্যাস উত্তোলন নীতিমালা অনুযায়ী যেভাবে রয়ালটি নির্ণয় করা হয়, কয়লার ক্ষেত্রেও তা-ই করলে লোকসানের পরিমাণও বেশি। তাই এই বিষয়টিও পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা করা জরুরি।

**অতঃপর নাইকো**

পরিশেষে নাইকোর প্রসঙ্গ টেনেই আজকের লেখার উপসংহার। নাইকো প্রসঙ্গ এটা বোঝানোর জন্য টানবো যে, যদি আমাদের ন্যাশনাল এনার্জি পলিসির কোনো কার্যকারিতা থাকতো তাহলে নাইকোর সঙ্গে চুক্তির ক্ষেত্রে যে যে বিষয়গুলোর ফাঁক থেকে গেছে তা থাকতো না। এ তো গেল পলিসি কার্যকর থাকার একটি দিক। পলিসি কার্যকর থাকলে আরেকটা লাভ হতো। তা হলো নাইকোর সঙ্গে চুক্তির ফাঁক থাকা সত্ত্বেও চুক্তিতেই বর্ণিত সুবিধাগুলো আদায় করা যেত। যেমন নাইকোর সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্টের ১৩ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা হয়েছে, The validity, interpretation and implementation of this JVA (joint venture agreement shall be goverred by the laws of Bangladesh. অর্থাৎ বাংলাদেশের আইন দ্বারাই সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হবে। তারপরও নাইকোর বিরুদ্ধে কিছু করা গেল না। শুধু তাই নয়, JVA-এর ২৬.৫.২ অনুচ্ছেদও নাইকোর বিরুদ্ধে ছিল। নাইকোর সঙ্গে যে ফ্রেমওয়ার্ক অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে সেখানে অনুচ্ছেদ ১০ ও সহঅনুচ্ছেদ ১০(২), ১০(৩), ১০(৪), ১০(৫), ১০(৬), ১০(৭), ১০(৮), ১০(৯)-এ যেসব শর্ত বর্ণিত আছে সেগুলো অনুসারে স্পষ্টত নাইকোকে দায়ী করা যায়। বিশেষ করে ১০(১) অনুচ্ছেদটি পাঠককে ভালোভাবে লক্ষ্য করতে বলবো 'The laws of the people's Republic of Bangladesh shall govern the validity, interpretation and implemetation of the Agrement.'

পরিশেষে শুধু এ কথাই বলবো, নীতিমালা না থাকলে একটা কথা ছিল। কিন্তু আমাদের শক্তিসম্পদ (এনার্জি) ব্যবস্থাপনার একটি নীতিমালা আছে। এখনও যদি এ নীতিমালার আলোকে পদ্ধতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে জাতি হিসেবে আমাদের পঙ্গু হয়ে যেতে হবে। কে না জানে এ শতাব্দী হলো শক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণতার শতাব্দী! এখানে যাদের হাতে শক্তি আছে, কর্তৃত্ব তাদের হাতেই। আমরা আমাদের এনার্জি দিয়ে কর্তৃত্ব করতে চাই না, কিন্তু নিজেদের সমৃদ্ধি তো চাই- নাকি?